নারীর বিরুদ্ধে হিংস্রতা, পণপ্রথা, বিবাহ বিচ্ছেদ

(Violence Against Women, Dowry, Divorce)

❖ নারীর বিরুদ্ধে হিংস্রতা

ভারতবর্ষে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীদের উপর হিংস্রতামূলক আচরণ অনেককাল ধরেই একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। দৈনিক পত্রিকা বা দূরদর্শনে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন খবর প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে। গৃহে, গৃহের বাইরে, কিংবা কর্মক্ষেত্রে, সব জায়গাতেই নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। সমাজতাত্ত্বিকরা কিছুকাল আগে পর্যন্তও নারীদের প্রতি হিংস্রতামূলক আচরণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেননি। ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিকদের এই লিঙ্গ-অন্ধ (Gender-blind) বা কারও কারও মতে লিঙ্গ দৃষ্টিক্ষীণ (Gender-myopia) সমাজ বিশ্লেষণ যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। যদিও সাম্প্রতিক কালে এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা মূলক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে শুরু থেকেই ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নারী পুরুষের অসাম্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গিতে একথা সাধারণভাবে বলা হয় যে, কোনো শ্রেণির নারী সেই শ্রেণির পুরুষের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মাত্রায় শোষিত। এঙ্গেলসের মতে, শ্রেণি শোষণের সাথে সাথেই শুরু হয় পুরুষ জাতি দ্বারা নারী জাতির অবদমন।

সাধারণ অর্থে নারীর বিরুদ্ধে হিংস্রতামূলক আচরণ বলতে নারীর উপর দৈহিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক— যে কোনো ধরনের নির্যাতন বা নিপীড়নকে বোঝায়। কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোনো ধরনের কাজ করতে বাধ্য করা, তার অধিকার খর্ব বা হরণ করা ইত্যাদি নারীর বিরুদ্ধে হিংস্রতামূলক আচরণের অন্তর্গত। গোবিন্দ কেলকার তাঁর 'ভায়লেন্স এগেনষ্ট উইমেন' পুস্তিকায় 'নারীদের

প্রতি হিংস্রতা' কথাটি সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, এই ধরনের 'হিংস্রতাকে' বৃহত্তর সমাজ অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষমতা সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। রাম আহুজা তাঁর 'ভায়লেন্স এগেনস্ট উইমেন' গ্রন্থে (1998) এ সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, নারীদের বিরুদ্ধে হিংস্রতা বা অপরাধ সংক্রান্ত কোনো গবেষণায় আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক বিন্যাসকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা, অপরাধ, নির্যাতন সংঘটিত হয়েছে এবং যে পরিস্থিতির সঙ্গে সর্বদা তাকে মানিয়ে চলতে হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার মূল্যায়ন প্রয়োজন বলে অধ্যাপক আহুজা মনে করেন। তাঁর মতে, নারীদের প্রতি হিংস্রতামূলক আচরণের ঘটনা সব সামাজিক গোষ্ঠী বা সমষ্টিতে একরকম নয়। এথনি গিডেন্স-এর মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষেরা তাদের আর্থ সামাজিক ও দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে মহিলাদের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসা, যৌন নিপীড়ন এবং ধর্ষণের মতো ঘটনা সংঘটিত করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষরা হল আক্রমণকারী আর মহিলারা আক্রমণের শিকার। কারও কারও মতে, 'নারীদের প্রতি হিংস্রতা' এমন এক সামাজিক অপরাধ যা স্থান, কাল, শ্রেণি, বয়েস কোনো কিছু মানে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে নারীদের প্রতি হিংসা সংঘটিত হচ্ছে। অনেক সময় গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে, যেখানে নারীকে অনেক নিরাপদ বলে মনে করা হয়, সেখানেও তার বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসা সংঘটিত হয়।

গার্হস্থ্য হিংস্রতা

গার্হস্থ্য হিংসার মূল শিকার মূলত গৃহবধূরাই। সাধারণত, শ্বশুরালয়ের লোকরাই বধূর উপর দৈহিক, মানসিক নির্যাতন করে থাকে। এর নানা কারণ থাকতে পারে। প্রধানত এই কারণগুলি হল —

- পণের চাহিদা
- সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত কারণ
- কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়া
- সন্তান না হওয়ার জন্য স্ত্রীকে দায়ী করা
- সাংসারিক ক্ষেত্রে শাশুড়ির ক্ষমতার প্রকাশ
- মদ্যপ, নেশাসক্ত স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য
- স্বামীর অন্য কোনো মহিলার প্রতি আসক্তি
- স্ত্রীকে 'দুশ্চরিত্রা' হিসাবে সন্দেহ করা বা অপবাদ দেওয়া

গার্হস্থ্য হিংসার কারণে নারী পারিবারিক পরিবেশেও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। গৃহের মধ্যেই দৈহিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, অপমান, লাঞ্ছনা, হুমকি, ভীতি প্রদর্শন 'গার্হস্থ্য হিংসা'র মধ্যে পড়ে। গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে ২৪শে অগাস্ট, ২০০৫ লোকসভায় 'Protection of Women from Domestic Violence Bill 2005' পাশ করা হয়। এই আইনে 'গার্হস্থ্য হিংসার' নতুন ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, নির্যাতনের কারণে কোনো মহিলার শারীরিক ক্ষতি হলে, অঙ্গহানি হলে তিনি প্রতিকার চাইতে পারেন। তাছাড়া, কুৎসা, অশ্লীল গালিগালাজ বা আর্থিক প্রশ্নেও (যেমন পণ-দাবি) মানসিকভাবে নির্যাতিতা হলে তিনি প্রতিকার চাইতে পারেন। যৌন নির্যাতন, মৌখিক বা আবেগজনিত অত্যাচারের জন্য তো শাস্তির বিধান আছেই। শুধুমাত্র গৃহবধূরাই নন, এই আইনে সুরক্ষা পাবেন পরিবারের অন্যান্য মহিলারাও। আগেকার ফৌজদারি আইনে বধূ নির্যাতন রুখতেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই বিলের আওতায় নির্যাতিত মহিলাদের বৃহত্তর অংশকে নিয়ে আসা হয়েছে। এতে মেয়েদের বাপের বাড়ি বা শ্বশুর বাড়িতে থাকার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। যে কোনো ধরনের হিংসাত্মক আচরণকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সন্তানের সাময়িক হেফাজতের অধিকার মায়ের ওপর অর্পণ করা হয়েছে— এইভাবে এই নতুন আইনে নারীদের জন্য এক সুসংহত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গার্হস্থ্য হিংসা রোধ আইন, ২০০৫ এ আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজ্য সরকার আইন রূপায়ণে প্রতিটি জেলায় একজন 'সুরক্ষা আধিকারিক' বা প্রোটেকশন অফিসার নিয়োগ করবে। এই পদে মহিলা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যে কোনো পরিবারের নিগৃহীতা মহিলা ঐ আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ জানাতে পারবেন। পরবর্তী পর্যায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন দাখিল করলে বিচারক নিগৃহীতা মহিলার আইনি অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। পরিবার ঐ আদেশ মানতে বাধ্য থাকবে। মহিলার যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে পরিবারকে। নির্যাতিতা মহিলাকে যাবতীয় আইনি সাহায্য বিনামূল্যে দেওয়া হবে। কারও কারও মতে, সুরক্ষা আধিকারিকের মত মধ্যস্থতাকারীদের নিয়োগের ফলে অনাবশ্যক আমলাতান্ত্রিক জটিলতার শিকার হবেন আইনি সাহায্যপ্রার্থী নির্যাতিত মহিলারা। তাঁদের মতে, এর ফলে দুর্নীতি ও লিঙ্গ বৈষম্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে। এই নিয়োগ অনেক সতর্কতার সঙ্গে করা প্রয়োজন।

অনেক সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন, নারীর আইনগত অধিকারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সত্ত্বেও পরিবারের অভ্যন্তরে তাদের বিরুদ্ধে হিংসা বা অপরাধের মাত্রা আশানুরূপ

ভাবে দূর করা যাচ্ছে না। অনেক অনেক ক্ষেত্রে নারী [illegible] নারীরাই [illegible] দায়ী। তাঁরা এ প্রসঙ্গে [illegible] পুরুষ, [illegible] উদাহরণ [illegible] [illegible] তাদের 'অসম্মানজনক মিল' [illegible] [illegible] পরিবারের [illegible] হিসাবে উল্লেখ করেছেন। [illegible] [illegible] একটি স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে দেখা হয়েছে। [illegible] নারী-অবমাননার প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসও ভারতীয় সমাজে পরিলক্ষিত হয়। [illegible] 'নারী অবমাননাকে' পরিবার পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে। [illegible] [illegible] শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। [illegible] প্রক্রিয়া পরিবারের মধ্যে পুরুষ-নারীর এই অসম মর্যাদাকে স্বাভাবিক ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলে।

আন্তর্জাতিক জনসংখ্যাবিজ্ঞান সংস্থা ভারতবর্ষের পরিবারগুলিতে বধূনির্যাতন সম্পর্কে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ১৫ থেকে ৪১ বছর বয়সী ৯০ হাজার ভারতীয় মহিলার ওপর এই সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় বিবাহিতা মহিলাদের ২১ শতাংশ নিয়মিত স্বামীর দ্বারা নির্যাতিতা হন। সমীক্ষাভুক্ত ৫৬ শতাংশ মহিলাই বিভিন্ন কারণে পরিবারে বধূনির্যাতনের বিষয়টিকে একটি 'স্বাভাবিক' ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে এই 'নির্যাতন' অন্যায় নয় বরং স্ত্রীর ওপর স্বামীর স্বাভাবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষের নির্যাতিতা বধূসংখ্যার বিশালতার চাইতেও আশঙ্কাজনক ভারতীয় নারীর নিজের দৃষ্টিতে বধূনির্যাতনকে স্বাভাবিক মনে করার মানসিকতা। নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই 'মেনে নেওয়ার' প্রবণতা বৃদ্ধির সম্পর্ক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অসংখ্য গৃহবধূ গার্হস্থ্য নির্যাতনকে নীরবে মেনে নেওয়াই শ্রেয় মনে করেছেন। সমীক্ষকদের কাছে এ সম্পর্কে কিছু বলে সংসারে 'অশান্তি' বাড়াতে চাননি। ভারতীয় মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা প্রতিরোধের যে কোনো প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তাঁদের এই নীরবতার সংস্কৃতি (Culture of silence) অন্যতম প্রতিবন্ধক।

সম্প্রতি একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে গার্হস্থ্য হিংসা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করা হয়েছে। তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে, ভারতে প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন করে মহিলা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হন। পত্রিকা সম্পাদকের মতে, গার্হস্থ্য হিংসা রোধে সংসদে বিল পাশ হওয়ার পর অবস্থার রাতারাতি উন্নতি হবে, এমন আশা বাতুলতা।

কিন্তু, এই আইন প্রবর্তন যে যথেষ্ট জরুরি ছিল তাও স্বীকার করা হয়েছে। তাঁদের মতে, এমন একটা প্রয়োজনীয় বিল পাশ করাতে এত বিলম্ব হওয়া থেকেই প্রমাণিত হয় সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির ভেতরে পিতৃতন্ত্রের ধারা কতটা গভীর। পিতৃকর্তৃত্বের যে হিংসা আপাত ভদ্রতার আড়ালে ঢাকা হোক, অসুখী গৃহাভ্যন্তরে যে উৎপীড়ক আচরণ নিয়মিত নারীকে তার দুর্বল ও সহজ শিকার হিসাবে বেছে নেয় তা নারকীয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় ছয় দশকের কাছে এসে সরকার এর প্রতিবিধানে উদ্যোগী হয়েছে তা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। ভারতবর্ষের কোটি কোটি গৃহকোণে যে সব নারী মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করেছিলেন এই ব্যবস্থা যদি সেই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা জোগাতে পারে, পত্রিকা সম্পাদকের মতে, তাই হবে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ বিল, ২০০৫-এর চূড়ান্ত সাফল্য।

২০০২-০৩ সালে সারা ভারতবর্ষের নারীদের বিরুদ্ধে ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৯৮টি নির্যাতনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল। যার মধ্যে ৬৫ হাজার ৬৫১টি অভিযোগ শ্লীলতাহানির, ৩১ হাজার ১৮২টি অভিযোগ ধর্ষণের এবং ১৩ হাজার ৫০০টি অভিযোগ পণপ্রথার জন্য মৃত্যুর। ২০০৩ সালে সারা ভারতবর্ষে গৃহক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের ফলে ৭ হাজার মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ধারা অনুযায়ী নারীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হলেও, এই ধারাটি আশানুরূপ ভাবে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি। শুধু আইনের সংস্থান যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়নি। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি। পণপ্রথার সঙ্গে কন্যা ভ্রূণ হত্যা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ বিভিন্ন সমীক্ষায় পাওয়া গেছে। পণের চাহিদাই কন্যা ভ্রূণ হত্যা ও কন্যা শিশু হত্যার মূল কারণ। বিগত বছরগুলিতে লিঙ্গ নির্ধারক গর্ভপাত উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ভ্রূণ নির্ধারণ প্রযুক্তির ব্যাপক অপব্যবহারের ফলে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ ভারতীয় মহিলাদের অপুষ্টি ও পারিবারিক হিংসার সম্পর্ক নিয়ে এক বৃহৎ সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতীয় মহিলাদের স্বাস্থ্যহীনতার সাথে গার্হস্থ্য হিংসার সরাসরি সম্পর্ক আছে। সমীক্ষাভুক্ত যে মহিলারা গার্হস্থ্য হিংসা সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়েছে, তাঁদের রক্তাল্পতায় ভুগবার সম্ভাবনা অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি। এই মহিলাদের সন্তানরা অন্য শিশুদের তুলনায় বেশি অপুষ্টিতে ভোগে। পরিবারের অভ্যন্তরে হিংসা সেই পরিসরে পিতৃকর্তৃত্বের প্রতিফলন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিবারগুলিতে মহিলারা বিভিন্ন

অত্যাচারের সম্মুখীন হন। এই পরিসরে কোনো মহিলার পক্ষে তাঁর প্রয়োজনীয় খাদ্য বা চিকিৎসার দাবি জানানো বা তা আদায় করা কার্যত অসম্ভব। সুতরাং গার্হস্থ্য বা পারিবারিক হিংসার উপস্থিতিতে মহিলাদের অধিকতর অপুষ্টিতে ভোগার সম্ভাবনা যথেষ্টই বেশি। (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯/৪/২০০৮)

নারী ও পুরুষের অনুপাত

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে নারী এখনো পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজে অবাঞ্ছিত। এতটাই যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইন্ডিয়ান মেডিকাল অ্যাসোসিয়েশন (আই.এম.এ)- এর সমীক্ষায় জানা গেছে, ভারতবর্ষে প্রতি বছর গড়ে কুড়ি লক্ষ কন্যাভ্রূণ নষ্ট করা হয়। নির্বিচারে কন্যাভ্রূণ হত্যা এবং শিশু কন্যা খুনের ফলে ভারতবর্ষে নারী পুরুষের অনুপাত ভীষণভাবে কমে যাওয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উদ্বিগ্ন। জনবিন্যাস বিশেষজ্ঞদের মতে, সমাজের ভারসাম্য রক্ষায় নারী-পুরুষের অনুপাত হওয়া উচিত ১:১। অর্থাৎ ১ হাজার পুরুষ থাকলে নারীও থাকা উচিত ১ হাজার। আই. এম. এ.-র সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ১৯০১ সালে ভারতবর্ষে ১ হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ছিল ৯৭২। ১৯৬১ সালে ৯৪১। ১৯৯১ সালে ৯২৭। ২০০১ সালের জনগণনায় হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ৯৩৩। দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের তুলনায় স্বাধীন ভারতবর্ষে নারী পুরুষ অনুপাত কম। আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের চিত্র একরকম নয়। সামন্ততান্ত্রিক অনগ্রসর রাজ্যগুলিতে হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা অনেক কম। শুধুমাত্র কেরল রাজ্যের নারী-পুরুষ অনুপাতই উন্নত দেশগুলির সাথে তুলনীয়। ভারতবর্ষে ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের লিঙ্গ অনুপাত গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। ১ হাজার পুত্র সন্তান পিছু কন্যা সন্তানের অনুপাত ১৯৯১ এ ছিল ৯৪৫। ২০০১ সালে তা কমে হয়েছে ৯২৭। ১৯৮১ সালে এই অনুপাত ছিল ৯৬২।

২০১১ সালের ভারতবর্ষের জনগণনার তথ্য থেকে প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যা ধরে বার করা লিঙ্গ অনুপাত প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিগত বছরগুলির পরিসংখ্যানের মতোই দেশের পশ্চিমাঞ্চলকে লিঙ্গ সাম্যের হারে পেছনে ফেলেছে পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল। ভারতবর্ষে ০-৬ বছর বয়সের লিঙ্গ অনুপাতও কমেছে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী গ্রামে এই সংখ্যা ছিল ৯৩৪, ২০১১ সালে তা কমে দাড়িয়েছে ৯২৩-এ। শহরে এই সংখ্যা ২০০১ সালে ছিল ৯০৬, ২০১১ সালে তা সামান্য কমে দাড়িয়েছে প্রতি হাজারে ৯০৫-এ। এই দশ বছরে দেশের ০-৬ বছর বয়সীদের লিঙ্গ অনুপাত ৯২৭ থেকে কমে দাড়িয়েছে ৯১৮-তে।

পশ্চিমবঙ্গেও এই সংখ্যা ২০০১ সালে ৯৬০ থেকে কমে ২০১১ সালে ৯৫০-এ দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণের রাজ্যগুলির লিঙ্গ অনুপাত দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী কেরালায় প্রতি হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ১০৮৪, পন্ডিচেরিতে ১০৩৭, তামিলনাড়ুতে ৯৯৬, অন্ধ্রপ্রদেশে ৯৯৩।

ধর্মভিত্তিক লিঙ্গ অনুপাতে শিখ ও জৈন ধর্ম বাদ দিয়ে সব ধর্মের ক্ষেত্রে ২০০১ সালের তুলনায় ২০১১ সালে লিঙ্গ অনুপাত কমেছে। ২০০১ সালে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ছিল হিন্দু ধর্মে ৯২৫, মুসলমান ধর্মে ৯৫০, খ্রিস্টান ধর্মে ৯৬৪, শিখ ধর্মে ৭৮৬, বৌদ্ধধর্মে ৯৪২, জৈন ধর্মে ৮৭০। ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে হিন্দু ৯১৩, মুসলমান ৯৪৩, খ্রিস্টান ৯৫৮, শিখ ৮২৮, বৌদ্ধ ৯৩৩ এবং জৈন ৮৮৯।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী গত দেড় দশকে নারীর প্রতি হিংসা দ্বিগুনেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১ সালে নারীর প্রতি হিংসার নথিভুক্তির সংখ্যা ছিল ১,৪৩,৭৯৫; সেই সংখ্যা ২০১৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩,৩৭,৯৯২। এই হিসেব শুধুমাত্র নথিবদ্ধ ঘটনার। নানা কারণে এখনো অনেক মহিলা তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের ঘটনা নথিভুক্ত করাতে পারেন না।

২০১৪ সালে ভারতবর্ষে মহিলাদের উপর হিংসা

২০০১	দেশ/রাজ্য	২০১৪
১,৪৩,৭৯৫	সারা ভারত	৩,৩৭,৯৯২
৬,৫৭০	পশ্চিমবঙ্গ	৩৮,২৯৯
৪,২৪৩	আসাম	১৯,১৩৯
৫,৩৫৬	বিহার	১৫,৩৮৩
২,২৯১	দিল্লি	১৫,২৬৫
৩,৩৯৩	হরিয়ানা	৮,৯৭৪
১২,১৭৫	রাজস্থান	৩১,১৫১
৬,০০২	কর্ণাটক	১৩,৯১৪
১৬,৪৭৭	অন্ধ্রপ্রদেশ	৩০,৬৪৮
৫,৩৫৭	ওড়িশা	১৪,৬০৬
২,২২৯	ঝাড়খণ্ড	৫,৯৭২

(সূত্র : ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, ২০১৫)

মধ্যে প্রায় আশি শতাংশই মহিলা, যাঁরা শ্রম আইনের সুবিধা এবং সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত।

কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা

কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর যৌন হেনস্থা একটি বাস্তব ও ব্যাপক সমস্যা হিসাবে সাম্প্রতিক কালে চিহ্নিত হচ্ছে। ইঙ্গিতপূর্ণ অশ্লীল আচরণ, যৌন লাঞ্ছনা, আদিরসাত্মক রঙ্গরসিকতা ইত্যাদির ফলে কর্মক্ষেত্রে নারীর পক্ষে অমর্যাদাকর ও নেতিবাচক এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ হল লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়ন যা নারীকর্মীকে দৈহিক বা মানসিকভাবে কিংবা উভয় দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এর ফলে নারীকর্মী তার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাপক অর্থে কর্মক্ষেত্রের আওতাভুক্ত হলেও ছাত্রীদের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মক্ষেত্রের আওতাভুক্ত নয়। সেই কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রের বিশেষ ধরনের সমস্যাগুলিকে পৃথকভাবে দেখতে হবে। ১৯৯৭ সালের ১৩ আগস্ট, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ) নারীর যৌন হেনস্থার প্রতিকারের লক্ষ্যে কিছু নির্দেশাবলি জারি করা হয়।

এই নির্দেশাবলি আইনগত বিচারে বাধ্যতামূলক ও অবশ্যপালনীয়। আদালতের নির্দেশাবলীর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নারী বিরোধী হিংসা ও বৈষম্য নিবারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার জন্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর। সরকারি ও বেসরকারি সংগঠিত-অসংগঠিত সব ধরনের কর্মপ্রতিষ্ঠানেই এই নির্দেশাবলি প্রযোজ্য। বেতন বা পদমর্যাদা নির্বিশেষে সব ধরণের মহিলা কর্মীই এই নির্দেশাবলির আওতাভুক্ত হবেন।

ধর্ম, পিতৃতান্ত্রিকতা ও নারী নির্যাতন

ভারতবর্ষের বেশির ভাগ ধর্মীয় শাস্ত্রে একদিকে নারীকে মহিমান্বিত করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে তার চপলা ও দুর্বল রূপও তুলে ধরা হয়েছে। ভারতীয় নারীর এই দুই রূপ চিত্র পরস্পর বিরোধী। অধ্যাপক এস.সি. দুবের মতে, ভারতীয় সমাজে নারীর দ্বিতীয় রূপটিই অধিকতর স্বীকৃতি পেয়েছে। নারীকে অবদমিত করার এই চিন্তা হিন্দু মুসলিম ধর্মাবলম্বীসহ প্রায় গোটা ভারতীয় সমাজেরই মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থান করে নিয়েছে। কমলা ভাসিনের মতে, অধিকাংশ ধর্মই পিতৃতান্ত্রিক,

যা পুরুষের কর্তৃত্বকে চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করতে শেখায়। ধর্মগ্রন্থগুলি পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক অতি প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে। প্রায় প্রতিটি ধর্মশাস্ত্রে অবাধ্য নারীকে শাস্তির বিধান দেওয়া আছে। অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত'র মতে নারীকে অবদমিত রাখতে প্রয়োজন হয় সনাতনী এবং নব্য পিতৃতান্ত্রিকতার যা কিনা ধর্মের হাত ধরে সমাজে আসে। মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ঐতিহ্যের অজুহাতে নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ বর্বর সতীপ্রথা যা আধুনিকতার মোড়কের আড়ালে এখনো মহিমান্বিত। ১৯৮৭ সালে রাজস্থানের দেওরালায় 'সতীর' ঘটনা একথাই প্রমাণ করে। সমাজতাত্ত্বিক রেণুকা সিং তাঁর গবেষণাভিত্তিক সাম্প্রতিক গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় মহিলাদের মানসিকতায় এবং সামাজিকীকরণে আধ্যাত্মিকতা এক বিশাল স্থান জুড়ে আছে। এমনকি শহরে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মহিলারা পশ্চিমি মূল্যবোধে প্রভাবিত হলেও ধর্মীয় আচার আচরণকে অস্বীকার করতে পারছেন না।

ঌ গণ মাধ্যম ও ভারতীয় নারী

কমলা ভাসিনের মতে, গণমাধ্যম শ্রেণি ও লিঙ্গভিত্তিক মতাদর্শ প্রচারের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নাজিব আনোয়ারের মতে, ভারতীয় সমাজে নারীর ভূমিকা ও তার অবস্থানের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম সঠিক ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ। ভারতবর্ষ সহ নয়টি দেশের ওপর করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা— সর্বত্রই মহিলাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করার প্রবণতা রয়েছে। মুনাফালোভী ব্যবসায়ীগণ পণ্যের বিজ্ঞাপনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের যেভাবে উপস্থাপিত করছে তার প্রতিক্রিয়াতে সমাজে নারীদের প্রতি অসম্মান ও নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঌ বিশ্বায়ন ও নারী

বিশ্বায়নের নীতির ফলে নারীরা যে ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত হচ্ছেন, সে সম্পর্কে বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে 'উইমেন স্পিক : ইউনাইটেড ভয়েস এগেনস্ট গ্লোবালাইজেশন, পভার্টি অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স' পুস্তিকাটিতে। বিভিন্ন সমীক্ষা ও সরকারি পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ তথা বিশ্বায়নের ফলে ধনী ও দরিদ্র এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে বর্তমান অসাম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে প্রথাগত কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের উচ্ছেদ হচ্ছে, অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় কর্মসংকোচন মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে

গ্রাসিত করে দিচ্ছে। বিশ্বায়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য বাড়িয়েছে, যার প্রতিফলন পড়েছে মেয়েদের জীবনের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও নির্যাতনের ঘটনায়। কারও কারও মতে, বিশ্বায়নের হাত ধরে যে একীভবন ঘটছে তার অনিবার্য লক্ষ্য হল মূলত নারী; কারণ সে চিরকালই সামাজিক শৃঙ্খলা থেকে ভোগাপণ্য সব কিছুরই বাহক হিসাবে চিহ্নিত। এঁদের মতে, বিশ্বায়নের পরিণতিতেই নারী আজ বেশি করে হিংসার শিকার ও সস্তা শ্রমের যোগানদার।

তত্ত্বগতভাবে সিমোন দ্য বোভোয়া দেখান যে পুরুষ-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কে নারীকে সবসময়ই দ্বিতীয় স্থানে থাকতে হয় কারণ সামাজিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পুরুষকেই অগ্রবর্তী স্থানে বসানো হয়। এর স্বরূপ উপলব্ধি করতে গিয়ে তিনি বলেন— 'মেয়ে হয়ে কেউ জন্মায় না, তারা মেয়ে হয়ে ওঠে।' অর্থাৎ নারীকে 'নরেতর' করে তোলাই সামাজিকীকরণের লিঙ্গভিত্তিক রূপ। কারও কারও মতে, শুধু লিঙ্গ বৈষম্যের কথা বললে চলবে না। দারিদ্র্য ও আর্থিক বৈষম্যের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের প্রতি হিংস্রতামূলক আচরণকে বুঝতে হবে। কেউ কেউ আবার মনে করেন, পারিবারিক কাঠামোকে আরও গণতান্ত্রিক না করলে, জমি ও অন্যান্য সম্পদ মেয়েদের নাগালের বাইরে থাকলে, লিঙ্গবৈষম্য ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার পটভূমি সঠিকভাবে তৈরি করা সম্ভব হবে না।

ভারতীয় নারী-পুরুষের সামাজিকীকরণের মধ্যে লিঙ্গ-বৈষম্য শিকড় গেড়ে আছে। তাকে বিনির্মাণ করে লিঙ্গ-সাম্যের মূল্যবোধ প্রবিষ্ট করানোই ভারতবর্ষের সমাজে ও পরিবারে নারীর প্রতি হিংস্রতামূলক আচরণ দূর করার পূর্বশর্ত। বস্তুত, সমাজে লিঙ্গ-সাম্য বিষয়ে উপযুক্ত সংবেদনশীলতা ছাড়া নারীর প্রতি হিংস্রতামূলক আচরণ রোধের কোনো রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাই আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারে না। পিতৃতন্ত্রের যুগসঞ্চিত প্রভাব কাটাতে না পারলে যাবতীয় আইনি সুরক্ষা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে নারীর বিরুদ্ধে হিংস্রতা রোধের কাজটি অসমাপ্তই থেকে যাবে।

❖ পণপ্রথা

ভারতবর্ষে নারী নির্যাতনের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে পণপ্রথাকে চিহ্নিত করা যায়। এই প্রথাকে কেন্দ্র করে বধূনিপীড়ন, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, হত্যা, আত্মহত্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ মাধ্যমে জায়গা করে নিচ্ছে।

অনেক সমাজেই বিবাহ অনুষ্ঠানের সাথে কিছু আর্থিক ও বস্তুগত দেনা-পাওনা জড়িত থাকতে দেখা যায়। কোনো ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষকে অর্থ বা দ্রব্যসামগ্রী

দেয়। তাকে কন্যাপণ বলা হয়। আবার কোনো ক্ষেত্রে পাত্রীপক্ষ পাত্রপক্ষকে অর্থ বা দ্রব্য সামগ্রী দেয়। তাকে বলা হয় বরপণ। অর্থাৎ পণ বা যৌতুক পাত্র বা পাত্রী উভয়েই পেতে পারে। তবে ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পণ বা যৌতুক পাত্রীপক্ষ পাত্রপক্ষকে দিয়ে থাকে। বিবাহের সময় পাত্রীর পরিবারকে পাত্রের পরিবারে অর্থসম্পদ, পোশাকপরিচ্ছদ, গহনা, আসবাবপত্র, গৃহে ব্যবহার্য নানা ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রদান করতে দেখা যায়। আবার অনেক সময় মনে করা হয় কত পণ দেওয়া নেওয়া হল তার ওপর পাত্রী-পাত্র উভয় পক্ষেরই সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করে। কিছু কিছু অর্থবান পরিবার তাদের তথাকথিত 'সামাজিক মর্যাদা' রক্ষার উপায় হিসাবে পণপ্রদানকে দেখে থাকে। আবার সামর্থ্য ভেদে কমবেশি পণ প্রদান প্রায় সব পাত্রীপক্ষের কাছেই সামাজিক ভাবে অবশ্য পালনীয় আচার হিসাবে পরিগণিত হতে দেখা যায়। পুরুষশাসিত সমাজে নারী-পুরুষের অসম সামাজিক মর্যাদার সুযোগে অনেক কাল থেকেই পণপ্রথা ভারতীয় সমাজে শিকড় গেড়ে আছে। ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাত প্রথা ও কৌলিন্য প্রথা পণপ্রথাকে আরও স্ফীতকায় করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' গল্পে পণপ্রথার বিষময় পরিণামের কথা জানা যায়। শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসেও পণপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে।

বর্তমান ভোগবাদী সমাজে মানুষের লোভ লালসার অন্ত নেই। বহু পাত্র এবং তাদের পরিবার বিবাহকে একটি লাভজনক অনুষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাই পণ দেওয়া নেওয়ার মত কুপ্রথা আধুনিক সমাজেও ভালোভাবেই টিকে আছে। তার ফলে কন্যাসন্তানকে দায় হিসাবে দেখা হয়। ভোগবাদী মানসিকতা মধ্যবিত্ত সমাজেও পণের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলেছে। ব্রিটিশ যুগে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের ফলে বিবাহ সম্পর্কের সময় শিক্ষিত পাত্রের কদর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সময়কাল থেকে পাত্রকে পণ দেওয়ার প্রথা নিন্দনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যায়, কন্যার পিতারা রোজগেরে শিক্ষিত পাত্রের জন্য উচ্চহারে পণ দিতে রাজি থাকেন। পাত্রপক্ষও ক্রমশই তাদের পণের দাবি বাড়িয়ে যেতে থাকে। এমনকি পাত্রের বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য খরচও পাত্রীর পরিবারকে বহন করতে দেখা যায়।

বিশিষ্ট বামপন্থী নেত্রী মনিকুন্তলা সেন তাঁর 'দ্য স্ট্রাগল এগেনস্ট ডাউরি' গ্রন্থে সমসাময়িক কালে পণপ্রথার ব্যাপ্তি ও কুফল সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে, হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হয়েছে কিন্তু তা বিবাহযোগ্যা নারীদের জীবনে আকাঙ্খিত মুক্তির বাতাস বয়ে আনতে পারেনি। পণপ্রথা বিরোধী বিল নিয়ে

লোকসভায় বিতর্ক চলাকালীন এই বিলের সমর্থনে মহিলাদের সই সংগ্রহ ও বিভিন্ন সভা সমিতির আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে লেখিকা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। —"আইনটি যখন উত্তেজিতভাবে আলোচিত হচ্ছে, তখন আমরাও মহিলাদের নিয়ে অনেক সভা সমিতির আয়োজন করেছিলাম এবং এই আইনের সমর্থনে অনেকের সই যোগাড় করেছিলাম। আমরা লক্ষ্য করলাম শহর ও গ্রামের বহু মহিলা এবং বহু কৃষকবধূ এই আইনের বিরুদ্ধে বলছেন। এটা ছিল মূলত তাদের ভয়ের কারণে। পণের অভাবে যদি কোনো মেয়ের বিয়েই না হয়, তাহলে আর এই আইনকে শুধু শুধু সমর্থন করে কি লাভ? আমাদের কর্মশালা চলাকালীন শুনতে পেতাম কত কৃষক পরিবার, নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোকে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে কি পরিমাণ জমি-অর্থ-সম্পদ হারাতে হত, কত পরিবার এইভাবেই সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু তারা সাহস সঞ্চয় করে বলতে পারত না, 'না, আমরা আর পণ দেব না'। এর কারণ হল যেন তেন প্রকারেণ মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। মেয়েদের অবস্থা বড়ই করুণ তা তারা যতই শিক্ষিতা ও গৃহকর্মে নিপুণা হোক না কেন! সমাজের চোখে তাদের কোনো দাম নেই। তাদের মূল্য নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি হল বিয়ের সময় কত, কি পরিমাণ গয়নাগাটি, টাকাকড়ি, জমিজমা তারা পণ হিসাবে পাবে।" এই অবস্থার মধ্যে ১৯৬১ সালে পণপ্রথা নিবারণ আইন (Dowry Prohibition Act, 1961) চালু করা হয়। ১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে এই আইন সংশোধনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করা হয়। তবুও পণের কারণে বধূনির্যাতন বা বধূহত্যার ঘটনা কমেনি। উত্তর ভারতে ১৪০০ পরিবারের ওপর একটি সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে, কন্যা সন্তানকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায় হিসাবে দেখা হয়েছে। পণপ্রথা-মেয়ের বিয়ের দুশ্চিন্তা এই পরিস্থিতির পেছনে মূল কারণ। ২০০২-০৩ সালে সারা ভারতবর্ষে ১৩ হাজার ৫০০টি পণপ্রথার কারণে মৃত্যুর (Dowry-Death) অভিযোগ ছিল। পণপ্রথা নিবারণে শুধু আইনের সংস্থান যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়নি। পণপ্রথার সঙ্গে কন্যাভ্রূণ হত্যা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ বিভিন্ন সমীক্ষায় পাওয়া গেছে। পণের চাহিদাই কন্যা ভ্রূণ হত্যা ও কন্যা শিশু হত্যার মূল কারণ।

১৯৯২ সালের তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় সমাজে প্রতি ১ ঘণ্টা ৪২ মিনিটে পণের কারণে একটি বধূহত্যা সংঘটিত হয়েছে। আর, এ বিষয়ে ২০০৩ সালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই সময়ে ভারতে প্রতি ঘণ্টায় ১টি পণের কারণে বধূহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় পণের জন্য বধূ হত্যার ঘটনা আগের থেকে বেড়েছে।

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় সমাজে পণপ্রথা ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯১৪ সালের ৩০শে জানুয়ারি ১৪ বছরের ছোট্ট মেয়ে স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় পণের কারণে আত্মহত্যা করে। সে আশঙ্কা করেছিল তার বিয়ের জন্য পণ দিতে গিয়ে তার বাবা দেউলিয়া হয়ে যাবে। আত্মহত্যা করে সে তার বাবাকে এই সমস্যা থেকে

উদ্ধার করতে চেয়েছিল। এই মৃত্যু পণপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কিছু কিছু মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে পারলেও সাধারণভাবে বলতে গেলে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও আইন আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-এর ২০০৪ সালের তথ্য সে কথাই প্রমাণ করে। এই তথ্য অনুযায়ী ২০০৪ সালে ৬৬৫৫টি মৃত্যু পণের কারণে ঘটেছিল (Dowry-Deaths)। ২০০১ সালে সংখ্যাটি ছিল ৬৮২২, অল্প কিছু বেশি। অনেক ক্ষেত্রে পণের কারণে মৃত্যু না ঘটলেও বধূ নিয়মিতভাবে নির্যাতিতা হন।

অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, হিন্দু সমাজের বিবাহ প্রতিষ্ঠানে পাত্র অধিক গুরুত্ব পায়। হিন্দু বিয়ের অনুষ্ঠানে 'কন্যাদানের' সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে আরও অনেক সামগ্রী 'দান' করা হয়। সনাতন প্রথা অনুযায়ী একে বলা হয় 'বরদক্ষিণা'। ধনী, জমিজমার মালিক জাতগুলি, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের রেড্ডি ও কাম্মা সম্প্রদায়, তামিলনাড়ুর পামগেরি ও আম্বাম্লাক্কারের গোষ্ঠীর মানুষেরা মেয়ের বিয়েতে নগদ টাকা, গয়না ও জমি দিয়ে থাকে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই যৌতুকের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এখন তা আর স্বেচ্ছায় দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ অনেক অর্থ, গয়নাগাটি ও অন্যান্য সামগ্রী যৌতুক হিসাবে দাবি করে এবং তা নিয়ে দরকষাকষি করে। নব্য ধনী সম্প্রদায় এই সমস্যাটি আরও বাড়িয়ে তুলেছে বলে অধ্যাপক দুবে মনে করেন। উঁচু পদে কর্মরত পাত্র ও তার পরিবার বিয়েতে অনেক পণ আশা করে এবং পেয়েও থাকে। হিন্দু সমাজের এই কুপ্রথা সমাজের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমান ও খ্রিস্টান সমাজেও পণপ্রথার কথা শোনা যায়। বিয়ের পরেও নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে পণ আদায় চলে। অধ্যাপক দুবের মতে, অতীতে যা একসময় বিয়ের পর মেয়েকে নিরাপত্তা দিতে পাত্রী-পরিবারের প্রয়াস হিসাবে চালু হয়েছিল, আজ তাই রূপ পরিবর্তন করে মেয়েদের মারণকাঠিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জাতের মধ্যে, অঞ্চলে অঞ্চলে পণপ্রথার প্রচলনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। শহর গ্রামেও এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পারিবারিক ঐতিহ্যের ওপরেও পণ নেওয়া বা না নেওয়ার বিষয়টা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে থাকে। অর্থাৎ সমাজকাঠামোর পার্থক্য, জাত, শ্রেণি, নৃকূলতা, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি নানা ভাবে পণ প্রথার অস্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলে থাকে। পণপ্রথার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কারণ জড়িত থাকে। এসবের মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত কিছু রীতিনীতি যেমন অনুলোম বিবাহ (Hypergamy), ক্রমোচ্চজাত বিন্যাস, পিতৃতন্ত্র, পুরুষশাসিত

সমাজে নারীর নিম্ন আর্থসামাজিক মর্যাদা, পরনির্ভরশীলতা ও অসহায়ত্ব, সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের মোহ, দারিদ্র্য, বেকারি, অসচেতনতা, উচ্চাভিলাষ, ইত্যাদিকে পণপ্রথার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

পণপ্রথা নিবারণ করতে শুধুমাত্র আইন প্রবর্তনই যথেষ্ট নয়। পণপ্রথা বিরোধী সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পাশাপাশি শিক্ষামূলক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্রে পণ দেওয়া নেওয়ার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। এলাকায়-এলাকায় পথনাটিকা, পথসভা, সচেতনতা সভা ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, সরকারি-বেসরকারি কর্মী, ব্যবসায়ীকে পণ দেওয়া নেওয়ার কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

১। যে সব বিজ্ঞাপন পণ চাহিদায় উৎসাহ দেয় সেগুলি নিষিদ্ধ করা।

২। পণগ্রহণ নিষিদ্ধ করার আইনের যথাযথ প্রয়োগ।

৩। সব সম্প্রদায়ের মহিলাদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগ।

৪। যে সব ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠানে পুত্র-প্রাধান্য জাহির করা হয় তা বাতিল করা।

৫। কন্যা সন্তানের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার।

আশার কথা, পণপ্রথার বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও জনমত গঠিত হবার খবর সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, উত্তর বাঁকুড়ায় রায় সম্প্রদায়ভুক্ত তফশিলি জাতিদের নিয়ে তৈরি হওয়া, 'পণপ্রথা বিলোপ সমিতি'-র কথা। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া, শালতোড়া, সোনামুখী বা বর্ধমানের কাঁকসা, পোক্তানগরের গ্রামে গ্রামে পণপ্রথা প্রতিরোধ করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলছে এই সমিতির সদস্যরা। গ্রামে গ্রামে পণের জুলুম ও নির্যাতন প্রতিরোধ করতে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংগঠিতভাবে এই পণ-বিরোধী আন্দোলনের ফলে ঐ সব গ্রামগুলিতে পণ দেওয়া-নেওয়ার সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে (আনন্দবাজার পত্রিকা ৩০ অগাস্ট, ২০০৩)। বস্তুত, শুধুমাত্র পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে নয়, সংগঠিতভাবে সচেতন মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সমাজে টিঁকে থাকা পণপ্রথার মতো সামাজিক সমস্যাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। বাঁকুড়ার ঘটনা তারই প্রমাণ।